Vol. 38 | No. 2 | 1995

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বঙ্কিমের চোখে মধুসূদন

Volume	38
Issue	2
Year	1995
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আহমদ কবির
Published online	February 1, 1995
DOI	10.62328/sp.v38i2.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v38i2.1
Pages	9-25
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
৩৮ বর্ষ : সংখ্যা ২

Check for updates

বঙ্কিমের চোখে মধুসূদন

আহ্‌মদ কবির

মাইকেল মধুসূদন দত্ত নিঃসন্দেহে উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি। উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বয়সে মধুসূদনের এক যুগের ছোট। উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকের শেষে মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবি : এর অর্ধযুগের মধ্যে বঙ্কিমও প্রতিষ্ঠিত ঔপন্যাসিক। পেশায় বঙ্কিম প্রশাসক এবং সেই সূত্রে ম্যাজিস্ট্রেটও ; মধুসূদন ব্যারিস্টার। অথচ বাঙালির এই দুই শ্রেষ্ঠ প্রতিভূর ছিল না কোনো ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা ; চিঠিপত্রের মাধ্যমেও নয়।

মধুসূদন সম্পর্কে বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গির একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দান বর্তমান নিবন্ধের অভীষ্ট। অগ্রজ কবি সম্পর্কে অনুজ কথাসাহিত্যিকের শ্রদ্ধার্ঘ, বঙ্কিমের নানা রচনায় মধুসূদনের কবিতার চরণের ব্যবহার, সাহিত্য-সমালোচনা প্রভৃতির আলোকে এই অনুসন্ধান।

অধ্যাপক, বাংলা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবির নাম জানতে চাইলে সবাই যে একবাক্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩)-এর নামই বলবেন তাতে কোনো সংশয় নেই। এ নিয়ে দ্বিমতের কিই বা আছে। সারা উনিশ শতকে মধুসূদনের চেয়ে অধিক শক্তিধর কবিব্যক্তিত্বের সন্ধান আমরা কোথায় পাব। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য হেমচন্দ্রের কবিত্বশক্তিত্বে খুব আস্থাশীল ছিলেন এবং হেমচন্দ্রের প্রতি তাঁর সবিশেষ প্রীতিও ছিল। কিন্তু হেমচন্দ্রের খ্যাতি কখনো মধুসূদনের চেয়ে বেশি হয়নি। এক্ষেত্রে মধুসূদনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনাও নিরর্থক। সন্দেহ নেই, রবীন্দ্রনাথের জন্ম উনিশ শতকেই এবং এই শতকেই তাঁর কবিপ্রতিভার প্রকৃত স্ফুরণও হয়ে গেছে, এবং অতি তরুণ বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো অতি সম্মানীয় সাহিত্যরথীর প্রশংসাও তিনি পেয়েছেন,[১] এবং একথাও সত্য যে, উনিশ শতকের মধ্যেই ছোট-বড় মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের অন্তত গোটা পঞ্চাশেক বই বেরিয়ে গেছে: তবু বলতে হয় রবীন্দ্রনাথ ঠিক উনিশ শতকের কবি নন, বিশ শতকেরই কবি। বিশ শতকের আধুনিক বাংলা কবিতার সমৃদ্ধ বিকাশের স্তরে এবং বিশ্ব পটভূমিতেই রবীন্দ্রনাথের মর্যাদাবান প্রতিষ্ঠা। সেক্ষেত্রে উনিশ শতকের সকল বাঙালি কবির শীর্ষস্থানে যে মধুসূদনই অবস্থান করবেন তাতে সন্দেহ কি!

বাংলা কবিতার আধুনিকতার, উনিশ শতকী আধুনিকতার, সূত্রপাত মধুসূদনকে দিয়েই। তিনি প্রথম বটে, কিন্তু তিনিই এ-শতকের বাংলা কবিতার সেরা প্রতিনিধি। মোট পাঁচখানি কাব্য আর কিছু বিক্ষিপ্ত কবিতা লিখেছিলেন তিনি। তরুণ বয়সে হিন্দু কলেজের ছাত্র হিসেবে কিছু ইংরেজি কবিতা এবং পরবর্তীকালে মাদ্রাজে প্রবাসজীবনে কয়েকটি ইংরেজি রচনা বিজাতীয় ভাষায় মধুসূদনের কাব্যাবদান। ইংরেজির ভূত মধুসূদনের ঘাড়ে বেশ চেপেই বসেছিল, কিন্তু যে মুহূর্তে এটি তাঁর ঘাড় থেকে নামল, সে মুহূর্ত থেকে মধুসূদন সংবিৎ ফিরে পাওয়া এক তুলনাহীন স্বভাবাপ্রেমিক। ১৮৫৬ সালে মাদ্রাজ থেকে প্রত্যাবর্তনের পরপরই কলকাতার সাহিত্যজীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলেন মধুসূদন। এ হতেই হবে, না হয়ে গত্যন্তর ছিল না, এ যে তাঁর ভবিতব্য। তিনি লিখলেন নাটক ও কবিতা, বিশেষ করে কবিতা। সম্ভবত এ কথা ঠিক যে মধুসূদনই বাঙালিদের মধ্যে পাশ্চাত্য কাব্যের প্রথম মোহগ্রস্ত পাঠক। অজানা দ্বীপ আবিষ্কারের উন্মাদনা তখন মধুসূদনকে যেন পেয়ে বসেছিল। তাঁর এ পাঠনেশা বাংলা কবিতার জন্য খুব উপকারের হয়েছিল এবং মধুসূদনের সব 'পরীক্ষা-বৃক্ষেই'[২] ফল ধরেছিল উত্তম। এর প্রমাণ নতুন নতুন আঙ্গিক ও রীতির প্রতিষ্ঠা। যে বিস্ময়কর বিমুগ্ধতার মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় কাব্যের সঙ্গে মধুসূদনের পরিচয় ঘটেছিল তা-ই তাঁকে ইউরোপীয় আদলে বাংলা ভাষায় এপিক, লিরিক, সনেট, ট্রাজেডি, কমেডি ইত্যাদি লিখতে এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগ করতে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। মধুসূদনের প্রকৃত সৃষ্টিশীল জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত — ১৮৫৯ থেকে ১৮৬২ — মাত্র

চারটি বছরে তাঁর প্রধান প্রধান কাব্য ও নাটক বেরিয়ে গেছে। *চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী* লিখলেন আরো পরে, বিদেশের বিপন্ন বিষাদময় দিনগুলোতে। বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর দেখা গেল তাঁর সৃষ্টিধারা প্রায় শুকিয়ে গেছে। অবশ্য আর কয়টা বছরই বা বেঁচে রইলেন তিনি। উনিশ শতকের অধিকাংশ বাঙালি বুদ্ধিজীবী দীর্ঘজীবী নন একথাটি আরেকবার ফলে যাওয়ার জন্যই মনে হয় মধুসূদনও বিনশ্বর হলেন মাত্র ৪৯-উত্তর বয়সে।[৩] একদা অমরত্ব-আকাঙ্ক্ষী এই কবি জীবনের ছক মোটেও মেলাতে পারেননি। জীবনের সুখ সুবিধা স্বস্তি বিধানে যে প্রযত্ন ও হিসেব থাকা দরকার তা মধুসূদনের মোটেও ছিল না। তাঁর জীবনকথা জেনে সবাই যে তাঁর প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করবেন সেইটি স্বাভাবিক।

বঙ্কিমচন্দ্রও দীর্ঘ আয়ু পাননি, মাত্র ৫৬ বছর বয়সে তাঁরও মৃত্যু ঘটে। তবে তাঁর জীবন বেশ শৃঙ্খলাপূর্ণ, গোছানো এবং সফল। মধুসূদনের মতো হৈচৈ ভরা দুরন্ত আবেগী জীবন বঙ্কিমের ছিল না; রাশভারি স্বল্পভাষী দেমাকি এই মানুষটি যা হতে চেয়েছিলেন তাই হলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট রূপে বঙ্কিমচন্দ্র এক অপূর্ব অনন্য কীর্তির অধিকারী। বি. এ. পাস করতে না করতেই বঙ্কিম হয়ে গেলেন পদস্থ সরকারি কর্মচারী, আমলা। ইংরেজের মর্যাদাবান আমলা বটে, কিন্তু সেই ভয়ংকর ইংরেজিয়ানার যুগে বঙ্কিম কিন্তু এক দারুণ নিষ্ঠাবান স্বভাষাপ্রেমিক ও সাহিত্যসাধক। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বঙ্কিমের মাঝে মধ্যে বনিবনা যে হয়নি সেও সত্য, তবু বঙ্কিম তাঁর চাকরির পুরো কার্যকাল শেষ করেই অবসর নিতে পারলেন। অবসর নেওয়ার পর বছর তিনেক মাত্র বেঁচেছিলেন। বঙ্কিম আমলা, কিন্তু তাঁর আমলা পরিচয় সাহিত্যিক পরিচয়ের দ্বারা ঢাকা পড়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র যে উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক তাতেও বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই। এই অবিস্মরণীয় গদ্যশিল্পী বাংলা ভাষাকে সর্বপ্রকার ভাবের ও জ্ঞানবিজ্ঞানের যথোপযুক্ত বাহন করে তোলেন এবং লেখেন বহু আকর্ষণীয় উপন্যাস এবং চিন্তামূলক ও রসপূর্ণ প্রবন্ধ। বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের জনক তিনি, প্রবন্ধ সাহিত্যেরও; প্রকৃত সাহিত্যপত্রিকারও জন্মদাতা তিনি। পাশ্চাত্য উপন্যাস, জ্ঞানবিজ্ঞান ও দার্শনিক চিন্তার সঙ্গে বঙ্কিমেরও বিমুগ্ধ পরিচয় ঘটেছিল। তার চমৎকার রূপায়ণ হয়েছে বঙ্কিমসাহিত্যে। বঙ্কিম মধুসূদনের চেয়ে চৌদ্দ বছরের ছোট এবং মধুসূদনের মতো তিনিও ইংরেজি রচনা দিয়ে সাহিত্য জীবন শুরু করেন। মধুসূদনের মতোই তিনিও পরে বিপুল গৌরবে ফিরে আসেন নিজের ভাষায়। মধুসূদনের সঙ্গে বঙ্কিমের ঘনিষ্ঠতা ছিল একথা কেউ বলেন না। উনিশ শতকের কলকাতার বিদ্বৎসমাজ কতই বা আর বড় ছিল; কিন্তু মধুসূদনে বঙ্কিমচন্দ্রে ঘনিষ্ঠতা ঘটবার সুযোগ যে হয়নি সে কথা সত্য। দেখা সাক্ষাৎও তেমন হয়েছে বলে মনে হয় না। উভয়ের জীবনীসূত্রে জানা যায় বঙ্কিম যখন

বারইপুরে ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তখন এক মামলার উকিল হয়ে মধুসূদন তাঁর কোর্টে গিয়েছিলেন। বঙ্কিমকে সরকারি আমলা হিসেবে কলকাতার বাইরে নানা জায়গায় কাজ করতে হয়েছিল। আর মধুসূদনও যে কলকাতায় সুস্থিত হয়ে আস্তানা গড়েছিলেন তাও নয়। কলকাতা, মাদ্রাজ, ফের কলকাতা, লন্ডন, প্যারিস, ভার্সাই, আবার কলকাতা, পঞ্চকোট ইত্যাদি নানা স্থানে মধুসূদনেরও অস্থির পদচারণা। মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো বই পড়েছিলেন কিনা, কিংবা পড়লে সে সম্বন্ধে তাঁর কোনো প্রতিক্রিয়া ছিল কিনা, কিছুই জানা যায় না। চিঠিপত্রেও দুজনের যোগাযোগ হয়নি। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের এই দুই শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ কেন পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে রইলেন সেটি একটি জিজ্ঞাসা বটে।

স্বভাবতই মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর সাহিত্যসাধনার জন্য সমকালে যথেষ্ট আলোচিত হবেন এটি ছিল প্রত্যাশিত, কেননা তাঁর নতুন কাব্যাঙ্গিক ও কলাকৌশল অনেক সাহিত্যামোদীর ও সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল:, বিশেষ করে তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দ, *মেঘনাদবধকাব্য* ও রাবণ চরিত্র। নিজের সৃষ্টির মান সম্বন্ধে মধুসূদনের কোনো সংশয় ছিল না। তবে নতুন রূপরীতি বাংলার পাঠক সমাজের সমাদর পাচ্ছে কিনা এ নিয়ে তাঁর জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল ছিল স্বাভাবিক। সেজন্য মধুসূদন যখনই কোনো কিছু লিখেছেন তখনই তিনি বন্ধুদের, অনুরাগীদের কিংবা বোদ্ধাদের মতামতের অপেক্ষায় থাকতেন। বিশেষভাবে তাঁর বন্ধু রাজনারায়ণ বসুর। তাঁকে তিনি পত্রাঘাতে জর্জরিতও রেখেছিলেন। এই অতি বিদিত নামের সঙ্গে যুক্ত হবে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, গৌরদাস বসাক, কেশব গঙ্গোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নাম; এবং হেমচন্দ্রের নামও, যিনি মধুসূদনের চোখে একজন 'রিয়েল বি.এ' এবং যিনি *মেঘনাদবধকাব্যের* প্রথম পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা লিখেছিলেন। এঁদের চেয়ে বঙ্কিম অবশ্য উঁচু মানের সমালোচক এবং একথাও সত্য, বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের পিতৃপুরুষও বঙ্কিমচন্দ্র। সৃষ্টিশীল সাহিত্য সমালোচনার রীতি পদ্ধতির নির্দেশাবলি তৈরি করে দিয়েছেন তিনি। এ নির্দেশাবলির একদিকে রয়েছে সাহিত্যশিল্পের নান্দনিক দিকের অর্থাৎ সৌন্দর্যসৃষ্টির গুরুত্ব, অন্যদিকে উনিশ শতকী হিতচেতনার আদর্শ। সাহিত্য সমালোচনা ও সাহিত্যতত্ত্বের দিক বিবেচনা করলে হয়তো আমরা বঙ্কিমচন্দ্রে রোমান কবি ও সাহিত্যতাত্ত্বিক হোরেসের প্রভাব উপলব্ধি করতে পারি। মানতেই হবে, পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্বের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটেছে বঙ্কিমের রচনার সুবাদে। এই রকম একজন বহুপাঠী রসবোদ্ধা যোগ্য সমালোচক খ্যাতিমান অগ্রজ কবির রচনাকর্মের মূল্যায়ন করে একটি বড় লেখা লিখবেন, সেইটি ছিল প্রত্যাশা। অথচ বঙ্কিম সে প্রত্যাশা পূরণ করেননি। যে ভক্তিপ্রীতি নিয়ে তিনি ঈশ্বরগুপ্ত ও দীনবন্ধুর জীবন ও সাহিত্যের মূল্যায়ন করেছেন, কিংবা যে

রসদৃষ্টি দিয়ে জয়দেব বিদ্যাপতি ও ভবভূতির কবিকৃতি পর্যালোচনা করেছেন;, মধুসূদনকে নিয়ে সেরকম কিছুই করেননি।

ঈশ্বরগুপ্তের কবিতাসংগ্রহের ভূমিকারূপে বঙ্কিম তাঁর জীবন ও কবিত্ব প্রসঙ্গে যে দীর্ঘ আলোচনাটি লেখেন তা অবশ্য গুরুকৃত্য (অন্যদের অনুরোধও ছিল), দীনবন্ধুকে নিয়ে লেখা হল বন্ধুকৃত্য, আর সঞ্জীবচন্দ্রকে নিয়ে লেখাটি হল অগ্রজকৃত্য। তাহলে ঘনিষ্ঠজন না হলে কি বঙ্কিম আর কারো সম্বন্ধে আগ্রহ দেখাবেন না? এ রকম বললে অবশ্য বঙ্কিমের উপর অবিচারই করা হবে, কেননা বঙ্কিম বহু বিষয়ে লিখেছেন, বহুজন সম্পর্কে লিখেছেন এবং দেখা যায় মধুসূদনের ব্যাপারেও বঙ্কিম মোটেও নিস্পৃহ ছিলেন না। বঙ্কিমের এই জ্ঞান নিশ্চয়ই হয়েছিল যে, মধুসূদন তাঁর কালের সবচাইতে শক্তিশালী কবি ব্যক্তিত্ব। সুতরাং তিনি যে মধুসূদনের একজন অভিনিবেশী পাঠকও হবেন তা স্বাভাবিক। তবে এটি ঠিক যে মধুসূদনকে নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বিচ্ছিন্ন কোনো প্রবন্ধ নেই— একটা যাও আছে তা মধুসূদনের মৃত্যুতে শোক রচনা, শ্রদ্ধার্ঘ। মধুসূদনকে নিয়ে বঙ্কিমের একমাত্র সবিস্তার আলোচনা আছে 'বেঙ্গলি লিটারেচার' নামের একটি বড় ইংরেজি রচনায়। এর সঙ্গে স্মরণযোগ্য *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসের কয়েকটি পরিচ্ছেদের শিরোভাগে মধুসূদনের কাব্যোদ্ধৃতির ব্যবহার[৪] এবং বিভিন্ন সাহিত্যবিষয়ক আলোচনায় মধুসূদন সম্পর্কে মন্তব্য ও অভিমত। এ মন্তব্যগুলো হয়েছে মধুসূদনসহ আরো কয়েকজন কবিকে নিয়ে একত্রে, কিংবা মধুসূদন বা তাঁর গ্রন্থ নিয়ে, বিচ্ছিন্নভাবেও। যেমন :

১. বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের রচনা, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী, মাইকেল মধুসূদন দত্তের ব্রজাঙ্গনা কাব্য, হেমবাবুর কবিতাবলী, ইহাই বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। অবকাশরঞ্জিনী আর একখানি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য।

[অবকাশরঞ্জিনী[৫], *বঙ্গদর্শন*, ১২৮০ বৈশাখ]

২. আধুনিক কবিদিগের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত একজন অত্যুৎকৃষ্ট।

[মানস বিকাশ[৬], *বঙ্গদর্শন*, ১২৮০ পৌষ]

৩. বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতার বিষয় সঙ্কীর্ণ, কিন্তু কবিত্ব প্রগাঢ়; মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কবিতার বিষয় বিস্তৃত, বা বিচিত্র, কিন্তু কবিত্ব তাদৃশ প্রগাঢ় নহে।

[ঐ]

৪. আধুনিক ইংরেজি কাব্যের অনুকারী বাঙ্গালি কবিগণ, কিয়দংশে আধ্যাত্মিকতা দোষে দুষ্ট। মধুসূদন যেরূপ ইংরেজি কবিদিগের শিষ্য, সেইরূপ কতকদূর

জয়দেবাদির শিষ্য, এইজন্য তাহাতে দোষ তাদৃশ প্রকট নহে।

[ঐ]

৫. বাঙ্গালিরা যে ইংরেজি শিখে, ইহাতে সকলেরই উৎসাহ। কিন্তু ইহার ফল কি, তাহার সমালোচনা কেবল আজিকালি হইতেছে। এক শ্রেণীর লোক বলেন, ইহার ফল মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি; ....

[প্রাচীনা ও নবীনা *বঙ্গদর্শন*, ১২৮১ বৈশাখ]

৬. মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙালীর কবি, ঈশ্বরগুপ্ত বাঙ্গালীর কবি।

[*ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ* ভূমিকা]

৭. সৌন্দর্যসৃষ্টিতে তিনি [ঈশ্বরগুপ্ত] তাদৃশ পটু ছিলেন না। তাঁহার সৃষ্টিই বড় নাই। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ইহারা সকলেই এ কবিতে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

[ঐ]

৮. মধুসূদন দত্ত মধ্যে মধ্যে অনুপ্রাসের ব্যবহার করেন, — বড় বুঝিয়া সুঝিয়া, রাখিয়া ঢাকিয়া ব্যবহার করেন - মধুর হয়।

[ঐ]

৯. ঈশ্বরগুপ্ত খাঁটি বাঙ্গালী, মধুসূদন ডাহা ইংরেজ।

[রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা]

১০. বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে অনুবাদ ও অনুকরণ উভয়ই লক্ষিত হইতেছে। বিদ্যাসাগর প্রভৃতি পণ্ডিতেরা অনুবাদ করেন, মধুসূদন দীনবন্ধু মিত্র সুকবিরা অনুকরণ করেন। *মেঘনাদবধ* ইলিয়দের অনুকরণ, নবীন তপস্বিনী 'Merry Wives of Windsor' নামক নাটকের অনুকরণ।

[প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা[৭], *বঙ্গদর্শন*, শ্রাবণ ১২৮১]

১১. রাবণ বা বৃত্রাসুর যে ছাঁদে ঢালা এ সে ছাঁচে ঢালা। আমরা রামায়ণের রাবণ বা পুরাণের বৃত্রের কথা বলিতেছি না। মধুসূদনের রাবণ- হেমচন্দ্রের বৃত্রাসুর। সে ছাঁচ বড় ভারি ছাঁচ। কিন্তু মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কাব্যের ধাত্রী ইংরেজি সাহিত্য।

['বাল্মীকির জয়'[৮], *বঙ্গদর্শন*, আশ্বিন ১২৮৮]

মন্তব্যগুলো ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে করা হয়েছে বটে, কিন্তু প্রসঙ্গ না জানলেও এগুলো বুঝতে বাংলা সাহিত্যের কোনো পাঠকের অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। স্বচ্ছ

অভিমত বঙ্কিমচন্দ্রের। ঈশ্বরগুপ্তকে নিয়ে বঙ্কিমের দীর্ঘ আলোচনাটি বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য তাৎপর্যপূর্ণ রচনা। এই প্রবন্ধেই বঙ্কিম বুঝিয়ে দিয়েছেন যে ঈশ্বরগুপ্তের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো রীতির বাংলা কবিতার যুগ অবসিত। রঙ্গরস পিঠাপুলি আর অনুপ্রাস নিয়ে গুপ্তকবি শাশ্বত বাঙালি পদ্যকার হয়ে রইলেন, পরিবর্তিত সময়ের কবি হতে পারলেন না। নতুন কালের কবিকুল ইংরেজি শিক্ষিত। পাশ্চাত্য কাব্যের সরোবরে মধুসূদন যে উত্তমরূপে অবগাহন করেছেন তা হৃদয়ঙ্গম করেই বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদনকে 'ডাহা ইংরেজ' বলেছেন, নিশ্চয়ই তাঁর খ্রিস্টান হওয়া কিংবা আচার-আচরণে ও পোশাক-পরিচ্ছদে তাঁর সাহেব হওয়ার জন্য নয়। মহাকাব্য লিখেই মধুসূদনের খ্যাতি, তবু বঙ্কিমচন্দ্র নবীন সেনের *অবকাশরঞ্জিনীর* আলোচনায় মধুসূদনকে জয়দেব বিদ্যাপতির কাতারে নিয়ে এলেন এই জন্য যে, এই ক্ষেত্রে মধুসূদনের অবদান রয়েছে। তার চেয়ে বড় কথা এই, সম্ভবত গীতিকাব্যের একটি চিরকালীন রূপ আছে; নতুবা জয়দেব ও মধুসূদনে কালগত ও স্বভাবগত উভয়ত দুস্তর ব্যবধান এবং দুজনকে এক করে দেখাও সমীচীন নয়। মধুসূদন *ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনা* ইত্যাদি গীতিকাব্য লিখেছেন বটে কিন্তু সেগুলোর রূপরীতি একটু সেকেলে; গ্রীক ও রোমান সাহিত্যের ওড, এপিসল্ বা সনেটের প্রতিকল্প; সেগুলো ভিক্টোরীয় যুগের ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থ শেলি কিটসের কবিতার মতো নয়। ভিক্টোরীয় যুগের কবি বায়রন মধুসূদনের প্রিয় কবি হলেও বায়রনিক বিষাদ মধুসূদনকে আচ্ছন্ন করে নি। বরং রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক গীতিকবিতায় আছে এই বিষাদ; আছে ওয়ার্ডসওয়ার্থ শেলি কিটসের প্রভাব। এই নতুন জাতের গীতিকবিতা বাংলা কবিতার আধুনিকতার আরেক পর্যায়। কারো কারো মতে এইটিই হল সত্যিকারের পর্যায়, যেমন বুদ্ধদেব বসু বলতে চেয়েছেন বাংলা কবিতার প্রথম আধুনিক হলেন রবীন্দ্রনাথ। রোমান্টিক ধারার প্রবর্তক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালকেই গুরুর আসনে বসিয়েছেন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র গীতিকাব্য বা আধুনিক বাংলা সাহিত্য বিষয়ে লিখলেও বিহারীলালের নাম কোথাও নেননি। বঙ্কিমের কোনো লেখায় বিহারীলাল নেই; এবং বিহারীলালকে নিয়ে বঙ্কিমের কোনো আগ্রহ ছিল বলেও মনে হয় না, বিহারীলালেরও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি প্রসন্নতা ছিল না [সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ১৯৮২ : ১৯৩]। অথচ বিহারীলাল বঙ্কিমচন্দ্র দুজনই সমকালীন এবং উভয়ের মৃত্যু হয় একই বছরে অর্থাৎ ১৮৯৪ সালে। বিদ্যাপতি জয়দেবের মতো প্রাচীন কবিদের তুলনায় এ কালের কবিদের কবিত্বের প্রগাঢ়তার ঊনতা বঙ্কিমের ধারণাগত, নতুবা মধুসূদনও কম প্রগাঢ় কবি নন। মনে হয় প্রাচীন কবিদের প্রতি বঙ্কিম অধিক অনুরাগী, অধিকতর আস্থাশীল। অবশ্য সমকালীন কবি সাহিত্যিকদের ব্যাপারে যথেষ্ট নিস্পৃহ ও মোহমুক্ত হওয়া দুরূহ। তবে বঙ্কিম যে আধুনিক কবিদের বিচিত্র

বিষয়মুখীনতা, বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপ্তি, উদারতা ও বর্হির্দৃষ্টিপ্রবণতার কথা বলেছেন তা তো অবশ্যই মাননীয়। আধ্যাত্মিকতা বলতে বঙ্কিম সম্ভবত বুঝিয়েছেন তত্ত্বগত চিন্তা বা দর্শন। কিন্তু আধুনিক কবিদের ক্ষেত্রে এটি একটি দোষ কেন সেটি বোধগম্য নয়। সবাই যে জয়দেবের মতো বিলাসকুতূহলী হবেন তারও তো কোনো মানে নেই। বঙ্কিম অবশ্য জয়দেবের ইন্দ্রিয়পরতাকেও দোষ বলেছেন। আধুনিক কবিতার বিষয়বস্তু সীমাহীন, আর তত্ত্বকে কত সুন্দর কবিতায় রূপ দেওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের রচনাই তার প্রমাণ। ভিক্টোরীয় যুগের কবিদের রচনার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রেরও নিশ্চয়ই ভালো পরিচয় ছিল। তা না হলে তিনি ওয়ার্ডসওয়ার্থ, পোপ বা জনসনকে আধ্যাত্মিক কবি বলতেন না। সে যাই হোক, সাহিত্য সমালোচক রূপে বঙ্কিমই প্রথম সুস্পষ্টভাবে জানালেন যে মধুসূদনাদির আধুনিক বাংলা কবিতার ধাত্রী হল ইংরেজি সাহিত্য।

অনুবাদে ও অনুকরণে যে পার্থক্য আছে সেটি অবশ্য স্বীকার্য। অনুকরণের সঙ্গে সৃষ্টিশীলতার প্রসঙ্গটি জড়িয়ে থাকে। কিন্তু অ্যারিস্টটলীয় অর্থে বঙ্কিম অনুকরণ শব্দটি নেননি, রাজনারায়ণ বসুর *সেকাল ও একাল* গ্রন্থপাঠের প্রতিক্রিয়া হিসেবে তিনি যে অনুকরণ'[৯] প্রবন্ধটি লেখেন তাতে এ বিষয়ে তাঁর ধারণা বোঝা যায়। তিনি বলেছেন 'উৎকৃষ্ট যে রূপ করে সেইরূপ কর, সেইরূপ হইবে। তাহাকেই অনুকরণ বলে।' সুতরাং অনুকরণ দূষ্য নয়, আর বাঙালি যে একালে ইংরেজের অনুকরণ করে সেটিও নিন্দনীয় নয়, যেহেতু তাঁর মতে বাঙালি অপেক্ষা ইংরেজ সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ। সাহিত্যে অনুকরণ বিষয়ে বঙ্কিমের অভিমত হল এই যে, পৃথিবীর প্রথম শ্রেণির কাব্যগুলো একে অপরের অনুকরণ মাত্র, যেমন 'বজ্জিলের মহাকাব্য, হোমরের প্রসিদ্ধ মহাকাব্যের অনুকরণ।' এই কথাটিকেই ঘুরিয়ে নিয়েই যেন বলা হল 'মেঘনাদবধ ইলিয়দের অনুকরণ।' বঙ্কিমের আগে কোনো বাঙালি সমালোচক সরাসরি *মেঘনাদবধকাব্যকে* হোমারের *ইলিয়ডের* অনুকরণ বলেননি, এমনকি হেমচন্দ্রও নন। হেমচন্দ্র তো তাঁর সমালোচনায় কাব্যের রূপ নিয়ে কিছুই বলেন নি; তাঁর আলোচনা প্রধানভাবে শব্দ ও ছন্দ নিয়ে। সুতরাং বঙ্কিমই প্রথম এই দুই কাব্যের রূপসাম্য নিয়ে কথা বলেছিলেন। এক্ষেত্রে অবশ্য স্মর্তব্য, রাজনারায়ণ বসুর কাছে লেখা মধুসূদনের চিঠিতে *ইলিয়ডের* উল্লেখ আছে। জগৎখ্যাত গ্রীক মহাকাব্যের অনুকরণ করাতে মধুসূদন নিন্দনীয় হলেন কিনা সেটি অবশ্য উল্লিখিত মন্তব্যে বোঝা যায় নি, তবে বঙ্কিম সবসময় প্রতিভাশালীর অনুকরণকে সুফলদায়ক ও প্রশংসনীয় বলেই মনে করে এসেছেন, যেমন তিনি ঐ 'অনুকরণ' প্রবন্ধেই লিখেছেন গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুকরণ করে রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির এবং রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুকরণ করেই আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ ও স্বাতন্ত্র লাভ হয়েছে। সুতরাং এ কথা

বলা যাবে, যদিও বঙ্কিম উল্লেখ করেননি, ইলিয়ডের অনুকরণ করে মধুসূদন ভালো কাজই করেছেন। *মেঘনাদবধকাব্য* নিয়ে বঙ্কিমের আরো বিস্তৃত সমালোচনা আছে, দোষত্রুটি নিয়ে মন্তব্য আছে; এবং এগুলো পাওয়া যাবে 'বেঙ্গলি লিটারেচার' প্রবন্ধে।

বঙ্কিম নিশ্চয়ই মিল্টন পড়েছিলেন, সুতরাং ব্ল্যাংকভার্স প্রভাবিত সম্পূর্ণ নতুন বাংলা ছন্দ অমিত্রাক্ষরের পঠনরীতি তিনি যে ভালো করে জানবেন তা স্বাভাবিক। এ প্রসঙ্গে পূর্ণচন্দ্র তাঁর অগ্রজ সম্বন্ধে লিখেছেন :

> অমিত্রাক্ষর ছন্দের নতুন সৃষ্টি হইলে উহার নামে আমার গায়ে জ্বর আসিত। কিন্তু যেদিন বঙ্কিমচন্দ্রকে 'মেঘনাদবধকাব্য' পাঠ করিতে শুনিলাম সেইদিন হইতে আমি এই কাব্যের গোড়া হইলাম। কতবার ইহা পড়িয়াছি, তাহার ঠিক নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুকরণে পড়িতাম [সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ১৯৮২ : ২২]।

কিন্তু ভালো করে পড়তে জানলেও একথা সত্য যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রতি বঙ্কিমের মনোভাব খুব অনুকূল ছিল না। বঙ্কিম ছন্দের কলাকৌশল যে খুব ভালো জানতেন এবং ছন্দ বিষয়ে খুব পাণ্ডিত্য রাখতেন তা মনে হয় না, যদিও বঙ্কিমও ছিলেন একজন কবি; ঈশ্বর গুপ্তীয় আদলের কবি, পয়ারের কবি। বঙ্কিম সংস্কৃত ছন্দগুলোর খোঁজখবর রাখতেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই এবং ছন্দে তিনি আরো হয়তো অভিনিবেশী ও পারদর্শী হতে পারতেন যদি তিনি কবিতা নিয়েই থাকতেন। কিন্তু প্রথম যৌবনে বঙ্কিম বুঝে নিয়েছিলেন যে কবিতা তাঁর এলাকা নয়, সে জন্যে তিনি গদ্যচর্চায় মনোযোগী হলেন এবং অচিরেই বিপুল সাফল্য ও স্বীকৃতি পেলেন। সে যাই হোক, পয়ারপাঠে অভ্যস্ত বাঙালি যদি শুধু অন্ত্যানুপ্রাসহীনতাকে অমিত্রাক্ষর বলে ভাবেন তাহলে মস্ত বড় ভুল হবে। বঙ্কিম গুরু ঈশ্বর গুপ্ত রঙ্গব্যঙ্গ করে অমিত্রাক্ষরের যে দশা ঘটিয়েছিলেন তা তো যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের চিঠিতেই আছে:

> কবিতা কমলা কলা পাকা যেন কাঁদি।
> ইচ্ছা হয় যত পাই পেট ভরে খাই।।[১০]

বঙ্কিমের ছন্দোজিজ্ঞাসায় এই তরল রঙ্গরসের বিন্দুমাত্র ঠাঁই ছিল না: কিন্তু এটি মানতে হবে যে, মধুসূদনের অনুসরণে যেসব নতুন কবি অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার

করেছেন তাঁদের বঙ্কিম মোটেও প্রশংসা করতে পারেননি। নবীন সেন যখন হিন্দুধর্মের একটি দার্শনিক ইতিহাস রচনার পরিকল্পনায় *রৈবতক কাব্যের* প্রথম তিন সর্গ লিখে বঙ্কিমের মতামতের জন্য পাঠিয়েছিলেন তখন বঙ্কিম তাঁকে এক ইংরেজি চিঠিতে অমিত্রাক্ষরে কাব্য লিখতে নিষেধ করেছিলেন। বঙ্কিমের মতে ইংরেজি মহাকাব্যে অমিত্রাক্ষর চললেও বাংলা মহাকাব্যের জন্য এ-ছন্দ একেবারেই অনুপযোগী। এক্ষেত্রে মধুসূদনের হয়তো কিছু সাফল্য রয়েছে; কিন্তু মধুসূদন যে ব্যাকরণরীতি, বাগ্বিধি ও ভাষার প্রাঞ্জলতার দিকটি বিসর্জন দিয়েছেন সেকথাও সত্য। এ অবস্থায় নবীন সেন যদি মহাকাব্য লিখতেই চান তাহলে বঙ্কিমচন্দ্রের পরামর্শ হল এই, প্রত্যেক সর্গে তিনি যেন ছন্দ পাল্টান এবং প্রধানত মিত্রাক্ষর ছন্দে লেখেন।[১১] বৃত্রসংহার কাব্য আলোচনা [*বঙ্গদর্শন* মাঘ ১২৮১] প্রসঙ্গে বঙ্কিম হেমচন্দ্রের ছন্দোরীতির প্রশংসা করেছেন এই জন্য যে তা দেশী প্রথার প্রতি ঘনিষ্ঠ থেকে সর্গে সর্গে পরিবর্তিত হয়েছে-

> ইউরোপে এ বিষয়ে একটি কুপ্রথা আছে; একটি ছন্দে এক একখানি বৃহৎ মহাকাব্য লিখিত হইয়া থাকে। ইহা পাঠক মাত্রেরই শ্রান্তিকর বোধ হয়। কতক কতক এই কারণে ইউরোপীয় মহাকাব্য সকল সামান্য পাঠকেরা আদ্যোপান্ত পড়িয়া উঠিতে পারেন না। এ দেশীয় প্রাচীন প্রথাটি ভাল— সর্গে সর্গে ছন্দঃ পরিবর্তন হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত দেশী প্রথা পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপীয় প্রথা অবলম্বন করিয়া স্বপ্রণীত কাব্যসকলের কিঞ্চিৎ হানি করিয়াছিলেন। হেমবাবু দেশী প্রথাটিই বজায় রাখিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার কাব্যের বৈচিত্র্য ও লালিত্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

ঐ আলোচনায় বঙ্কিম এও বলেছেন হেমচন্দ্র যদি অক্ষরবৃত্ত অমিত্রাক্ষরের পরিবর্তে সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত ছন্দে কাব্য লিখতেন তাহলে তিনি ভালো করতেন। হোমার মিল্টন দুই মহাকবিই তাঁদের জগদ্বিখ্যাত মহাকাব্য একটি ছন্দেই লিখেছেন এবং এতে বৈচিত্র্যের অভাব নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলেন নি। মধুসূদনের একক ছন্দ অমিত্রাক্ষরেও বৈচিত্র্যের বা লালিত্যের প্রসঙ্গটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছিল না।

ছন্দের দেশী প্রথার প্রতি বঙ্কিমের এত বিশ্বাসের কারণ পুরোপুরি বোঝা যায় না। সম্ভবত বঙ্কিম বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রদত্ত মহাকাব্যের সংজ্ঞার কথা মনে রেখেছিলেন। ঐ সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, একটি সর্গের অবসানের পর নতুন সর্গ পরিবর্তিত ছন্দ দিয়ে রচিত হতে হবে। অক্ষরবৃত্ত অমিত্রাক্ষরের বদলে মাত্রাবৃত্তে যে মহাকাব্য লেখা চলে না সেটি মাইকেল নিশ্চয়ই অনুধাবন করেছিলেন, নতুবা তিনি 'দেবদানীয়ম' নামের মহাকাব্য আট ছত্র লিখে থেমে যেতেন না। হয়তো

মাইকেলের অস্থির বিচিত্র খেয়ালের এটিও একটি। কিন্তু অমিত্রাক্ষর মাইকেলের মহত্তম সুকৃতি। ইউরোপীয় ছন্দকে বাংলা ছন্দের কাঠামোয় আশ্চর্য নৈপুণ্যে স্থাপন করেছেন মধুসূদন। এই ছন্দের মূল বৈশিষ্ট্য প্রবহমানতা। বাংলা ছন্দের মুক্তির ক্ষেত্রে অমিত্রাক্ষরের ভূমিকা যে এক কথায় ঐতিহাসিক একথাটি বঙ্কিম তেমন অনুধাবন করতে পারেননি, যেমন পেরেছিলেন পরবর্তীকালের দুই বিখ্যাত মধুসূদন নিন্দুক-রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেব বসু। রবীন্দ্রনাথের *ছন্দ* গ্রন্থ জুড়ে অমিত্রাক্ষরের স্তুতি আর বুদ্ধদেবের 'মাইকেল'[১২] প্রবন্ধে শত নিন্দা থাকলেও অমিত্রাক্ষরের রয়েছে কুণ্ঠাহীন প্রশংসা। বলাবাহুল্য, মধুসূদনই অমিত্রাক্ষরের আবিষ্কর্তা এবং এ ছন্দের যা কিছু উৎকর্ষ সবটাই তাঁরই রচনার মধ্যে। এ-ছন্দ যে মহাকাব্যের সম্পূর্ণ উপযোগী তা মধুসূদনই কেবল পূর্ণভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন; অন্য কেউ নন, হেমচন্দ্রও নন, নবীনচন্দ্রও নন। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যিক ছন্দে দুর্বলতা যে ছিল সেটি মানতে হবে।

'বেঙ্গলি লিটারেচার' নামের দীর্ঘ ইংরেজি প্রবন্ধটি হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের *কবিচরিত* (১৮৬৯) [*'লাইভস অব বেঙ্গলি পোয়েটস'*] গ্রন্থের আলোচনাসূত্রে রচিত হয়েছিল এবং এটি *ক্যালকাটা রিভিউ* পত্রিকাতে লেখকের নাম ছাড়াই ছাপা হয়েছিল ১৮৭১ সালে মাইকেলের মৃত্যুর দু'বছর আগে।[১৩] গোলাম মুরশিদ তাঁর *আশার ছলনে ভুলি* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন মাইকেলকে নিয়ে *বঙ্গদর্শনে* প্রকাশিত বঙ্কিমের শ্রদ্ধাঞ্জলিটির 'কয়েক বছর পরে' *ক্যালকাটা রিভিউতে* ঐ ইংরেজি রচনাটি বের হয় [গোলাম মুরশিদ ১৯৯৫ : ৩৫২]। কয়েক বছর আগে বললে তথ্য অভ্রান্ত হতো। যাই হোক, রচনাটিতে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আলোচনাকেই মুখ্য অংশ করা হয়েছে। সম্ভবত বঙ্কিম বুঝে নিয়েছিলেন যে, নিজের ঢাক নিজে না পেটালেই নয়; সেজন্য ঈশ্বর গুপ্ত, বিদ্যাসাগর, টেকচাঁদ, মধুসূদন, দীনবন্ধু প্রমুখ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সেরা রূপকারদের পর্যালোচনার মধ্যে তিনি নিজেকেও অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন; যদিও ঐ সময়ের মধ্যে তাঁর *দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা* ও *মৃণালিনী* এই তিনটার বেশি উপন্যাস প্রকাশ পায়নি। এগুলোকে সেরা তিনখানি জনপ্রিয় বাংলা বই হিসেবে উল্লেখ করে বঙ্কিম *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসের আখ্যানভাগও বর্ণনা করেছেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্য যে পাশ্চাত্য অনুকরণের ফসল সে কথাটিও এ আলোচনায় সমাপ্তিতে এসেছে।

মধুসূদন সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা পৃষ্ঠা দুয়েক। কোনোক্রমেই এটি পর্যাপ্ত আলোচনা নয়, মধুসাহিত্যের বিশদ আলোচনাও নয়, তবু এ আলোচনাকে বোধ হয় 'অবমূল্যায়ন' বলা ঠিক নয়।[১৪] কেননা, এই অপরিসর আলোচনায়ও বঙ্কিমের

কিছু কিছু মন্তব্য, বিশেষ করে *মেঘনাদবধকাব্য* সম্পর্কে, যথাযথ ও সঠিক বলে বিবেচিত হয়েছে। তরুণ রবীন্দ্রনাথের কিংবা পরিণত বুদ্ধদেব বসুর *মেঘনাদবধকাব্য* আলোচনায় যে তীব্র কটু ঝাঁঝালো আক্রমণ রয়েছে বঙ্কিমের লেখায় তা অবশ্য নেই, তবে প্রশংসা অপ্রশংসা মিলিয়ে বঙ্কিমের অভিমত সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব বসু উভয়েই এ আলোচনায় প্রভাবিত হয়ে থাকলে বিস্ময়ের কিছু নেই। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার সুকুমার সেনের *মেঘনাদবধকাব্য* সম্বন্ধে অভিমতসমূহ এ আলোচনার দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে হয়।[১৫] নাট্যকার মধুসূদন নয়, কবি মধুসূদনই বঙ্কিমের আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। বঙ্কিম বলেছেন, উৎসাহী কেউ কেউ মধুসূদনকে কালিদাসের সঙ্গে তুলনা করেন, কেউ কেউ তাঁকে সাধারণ কবির স্তরে ফেলেন; কিন্তু অনেক প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও বঙ্কিমের দৃষ্টিতে, মধুসূদন মহৎ কবিদের পর্যায়ভুক্ত নন। এরকম মনোভাব বঙ্কিমের হতেই পারে, কেননা আজকের দিনে মাইকেলের মহিমা নিয়ে আমরা যত উল্লসিত, সমকালে মাইকেল অতখানি ভাবমূর্তির অধিকারী ছিলেন না। বঙ্কিম কিন্তু মধুসূদনকে সকল বাঙালি কবির উপরেই স্থান দিয়েছেন এবং তবে এও বলেছেন, নতুন শব্দ তৈরি করে এবং অমিত্রাক্ষর প্রবর্তন করে মধুসূদন বিরূপ সমালোচনার পাত্র হয়েছেন। মধুসূদনের সবগুলো কাব্য নিয়েই বঙ্কিম আলোচনা করেছেন। বেশি আলোচনা করেছেন *মেঘনাদবধকাব্য* নিয়ে, সবচেয়ে কম আলোচনা করেছেন সনেট নিয়ে।

আর সকলের মতো বঙ্কিমও বলেছেন মেঘনাদবধকাব্য মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কবিকর্ম এবং এর বিষয়বস্তু ভারতীয় কবিদের চিরকালীন ভাব-উৎস রামায়ণ থেকে চয়িত। বাল্মীকির কাছে মধুসূদনের অশেষ ঋণ। কিন্তু কাব্যটির আদ্যোপ্রান্ত তাঁরই সৃষ্টি—দৃশ্য, চরিত্র, উপাখ্যান সবকিছুই। এগুলোকে ফুটিয়ে তুলতে মধুসূদন উচ্চ শিল্পাদর্শের পরিচয় দিয়েছেন। বাল্মীকির মতো, হোমার মিল্টনের কাছেও তিনি ঋণী— কিন্তু এই ঋণের স্বীকরণ হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি আধুনিক বাংলা কাব্যের সবচাইতে মূল্যবান রচনা। চরিত্রগুলো এমনভাবে পরিকল্পিত যাতে সহজে পাঠকের সহানুভূতি আদায় করতে পারে। কলাকৌশলে, যেমন অতিপ্রাকৃতের ব্যবহারে দক্ষতা রয়েছে। কাব্যের রূপকল্পগুলো চমৎকার, কল্পনা বিচিত্র, ভাষা কাব্যিক এবং শব্দ ভাবপ্রকাশের সম্পূর্ণ উপযোগী। কবিতার ছন্দধ্বনি মিল্টনের সাঙ্গীতিক সৌন্দর্য স্মরণ করিয়ে দেয়।

কাব্যের এই অকুণ্ঠ প্রশংসা শেষে বঙ্কিম এও উল্লেখ করেছেন যে, মধুসূদন কিন্তু সম্পূর্ণ নির্দোষ নন। ভারী ভারী আড়ম্বরময় শব্দ ব্যবহার মধুসূদনের প্রতিভার কোনো পরিচয় নয়। একই উপমার বা রূপচিত্রবর্ণনার পুনরাবৃত্তি বিরক্তিকর।

তারপর মধুসূদন কুশীলকবৃত্তি থেকেও মুক্ত নন। হোমার, বাল্মীকি, মিল্টন, কালিদাস সকলের কাছ থেকেই তিনি প্রচুর অধিগ্রহণ করেছেন। ইংরেজি আদর্শের বাংলা ক্রিয়ারূপ স্তুতিলা, স্বনিলা, নির্ঘোষিলা ইত্যাদির ব্যবহারে বঙ্কিম তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছেন। তবে *মেঘনাদবধকাব্য* সম্পর্কে তিনি বলেছেন, সব মিলিয়ে এটি অত্যন্ত সুন্দর কাব্য। কোনো জায়গা থেকে একটি অংশ উৎকলন করে এর সৌন্দর্য বোঝা যাবে না, যেমন একটি ইট খসিয়ে নিয়ে কোনো ভবনের সুষমা উপলব্ধি করা যায় না।

মধুসূদনের প্রথম কাব্য *তিলোত্তমাসম্ভব* প্রসঙ্গে বঙ্কিম বলেছেন, এটি *মেঘনাদবধের* চেয়ে নিকৃষ্ট। অন্যদিকে *বীরাঙ্গনা* অনেক পরিণত রচনা। *মেঘনাদবধকাব্যের* শ্রেষ্ঠত্বই এর বাকপ্রতিমা, শব্দৈশ্বর্য ও সঙ্গীতগুণ। বৈষ্ণবীয় প্রসঙ্গ সবসময় বঙ্কিমের ভক্তিপ্রীতির উৎস, সেজন্য *ব্রজাঙ্গনার* প্রশংসায় বঙ্কিম কুণ্ঠাহীন। বঙ্কিম উল্লেখ করেছেন, রাধাবিরহের মতো একটি বহু ব্যবহৃত বিষয়কে মধুসূদন অভিনব ও মনোরম করে প্রকাশ করেছেন এবং এ কাব্যের মিত্রাক্ষর ছন্দেও মধুসূদনের পারদর্শিতা অমিত্রাক্ষরের মতোই। বস্তুত মিত্রাক্ষর রচনাই শ্রেষ্ঠ এরকম বলার মধ্যে রয়েছে অন্ত্য মিলের কবিতার প্রতি, আর সকল কবিতাপ্রেমিক বাঙালির মতো, বঙ্কিমেরও সহজাত সংস্কার। মধুসূদনের সনেটের অনুরাগী নন একথা বঙ্কিম কেন বললেন বোঝা গেল না। সনেটগুলো বঙ্কিম ভালো করে পড়ে দেখেছেন বলে মনে হয় না। এগুলো যে ইউরোপে রচিত সেটি মোটেও অভিনব কোনো সংবাদ নয়, কিন্তু মধুসূদন এত সনেট লিখলেন; স্বদেশ, ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে কত কত সুন্দর সনেট; সেগুলোর কিছুমাত্র উল্লেখ না করে শুধু কতিপয় ইউরোপীয় কবির উদ্দেশ্যে রচিত সনেটগুলোর প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন কেন বোধগম্য নয়। মধুসূদনের কিছু সনেটের শিল্পমান ও বিষয়গৌরব যে অসামান্য তা অনস্বীকার্য।

বঙ্কিমের দৃষ্টিতে নাট্যকার মধুসূদন একজন অসফল শিল্পী। *শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী* এই তিনটি নাটককে বঙ্কিম কোনো মূল্য দেন নি। বঙ্কিম মনে করেন, বাঙালিদের মধ্যে সত্যিকারের নাট্যক্ষমতার পরিচয় কেউ দিতে পারেন নি। এমনকি, যাঁকে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কালের সেরা নাট্যকার বলেছেন, তাঁর সেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু দীনবন্ধুকেও নম্বর দিতে বঙ্কিম গররাজি। নাট্যকার মধুসূদন সম্পর্কে বঙ্কিম তীব্র কঠোর মন্তব্য করেছেন এই রকম— যে মুহূর্তে মধুসূদন নাটক রচনায় বসেছেন সে মুহূর্তে কবিপ্রতিভা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে। কবি মধুসূদন যে সবসময় নাট্যকার মধুসূদনের উপরে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু মধুসূদনের নাট্যপ্রতিভা মোটেও দীন নয়। এক্ষেত্রে বঙ্কিমকৃত মূল্যায়ন যে যথাযথ নয় তা মানতে হবে। সম্ভবত বঙ্কিমের মনে ইউরোপীয় নাটকের বিশেষ করে

শেক্সপীয়রের নাটকের উচ্চ শিল্পাদর্শ কাজ করেছিল। নতুবা বাংলা নাটক নিয়ে এতখানি অশ্রদ্ধা বঙ্কিম হয়তো পোষণ করতেন না। বঙ্কিম অবশ্য মধুসূদনের প্রহসনের, বিশেষ করে *একেই কি সভ্যতার* উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে মধুসূদনকে নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বিচ্ছিন্ন কোনো বাংলা প্রবন্ধ নেই, শুধু একটি ছাড়া। সেটি অবশ্য শ্রদ্ধার্ঘ। বঙ্কিমচন্দ্রের স্মরণীয় বাংলা সাহিত্যপত্র *বঙ্গদর্শন* মধুসূদনের মৃত্যুর আগের বছর প্রকাশিত হয়েছিল। মধুসূদনের কোনো রচনা এ পত্রিকায় ছাপানোর সুযোগ ঘটেনি। ১৮৭৩ এর ২৯ জুন মধুসূদনের মৃত্যু হলে বঙ্কিমচন্দ্র খ্যাতনামা অগ্রজ কবির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে একটি শোকজ্ঞাপক রচনা (obituary) *বঙ্গদর্শনের* ১২৮০ সনের ভাদ্র সংখ্যায় ছাপেন. সঙ্গে হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র প্রমুখের শোক কবিতাও ছাপা হয়। 'মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্ত' নামের এই অতি সংক্ষিপ্ত রচনাটি উজ্জ্বল কোনো লেখা নয়, মধুসূদনের সাহিত্যের মূল্যায়নও নয়, তবে বাঙালি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বড় অবদানের জন্য মধুসূদনের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য কিছু উক্তি এতে রয়েছে। এই উক্তিগুলোই জানিয়ে দেয় যে, বঙ্কিমের চোখে মধুসূদন একজন সেরা বাঙালি। শুধু কবিদের হিসেব ধরলে বলা যাবে- 'জয়দেব গোস্বামীর পর শ্রীমধুসূদন'। কোথায় জয়দেব আর কোথায় মধুসূদন, প্রায় হাজার বছরের ব্যবধান! এই দুইয়ের মাঝে স্মরণীয় বাঙালি কবির সংখ্যা কম নয়। আছেন চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র। বঙ্কিম তাঁর লেখায় এদের নাম উল্লেখ করলেও ঐ দুই কবিকে শ্রেষ্ঠ আসনে বসিয়েছেন। জয়দেব বাংলায় লেখেননি, তবু বঙ্কিম তাঁকে অতি উল্লেখযোগ্য বাঙালি কবির মর্যাদা দিয়েছেন। তারপর চলে এসেছেন একেবারে তাঁর কালে, মধুসূদনের সৃষ্টিসম্ভারে। শুধু কবির জগতে নয়, মুষ্টিমেয় মনুষ্যপদবাচ্য চিরস্মরণীয় বাঙালির মধ্যেও মধুসূদন আছেন। সুতরাং বঙ্কিমের চোখে মধুসূদন যে কী অনন্য সম্মানের অধিকারী ছিলেন তা অনায়াসে অনুমেয়। বঙ্কিম মনে করেন ইউরোপীয় জ্ঞানচর্চার জন্যই মধুসূদনের মতো কবিকে আমরা পেয়েছি, সুতরাং এ জ্ঞানচর্চা থেকে বিরত হলে চলবে না- "কাল প্রসন্ন-ইউরোপ সহায়-সুপবন বহিতেছে দেখিয়া, জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও—তাহাতে নাম লেখ শ্রীমধুসূদন।" বাঙালির চিত্তলোকে প্রবাহিত সুপবন হলো ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের হাওয়া। স্বদেশের মনের মাটিতে এই হাওয়া যে সুফল বয়ে আনলো তার দৃষ্টান্ত মধুসূদন দত্ত। এঁর মাতৃভাষাচর্চার বিপুল গৌরবকে বঙ্কিমচন্দ্র সবসময় স্মরণে রেখেছিলেন। রমেশ দত্তকে বাংলা লেখায় উৎসাহিত করার জন্য বঙ্কিম বলেছিলেন :

"দেখ, তোমার কাকা গোবিন্দচন্দ্র ও শশীচন্দ্র এবং মধুসূদন দত্ত হিন্দু কলেজের সেরা ছাত্র। গোবিন্দচন্দ্র ও শশীচন্দ্রের ইংরেজি কবিতা টিকবে না, কিন্তু যতদিন বাংলা ভাষা থাকবে ততদিন মধুসূদনের বাংলা কবিতাও বেঁচে থাকবে।"[২৬]

টীকা

১. তরুণ রবীন্দ্রনাথের অসামান্য গুণগ্রাহী ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। নানা প্রসঙ্গে ও মন্তব্যে তা জানা যায়। যেমন :

ক. *সন্ধ্যাসংগীত* (১৮৮২) ও *বৌ-ঠাকুরানীর হাট* (১৮৮৩) প্রকাশিত হলে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বিস্তর প্রশংসা করেন।

খ. He is a talented youngman. [ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৬৬ : ১৬৪]।

গ. রবীন্দ্র বাবু প্রতিভাশালী, সুশিক্ষিত, সুলেখক, মহৎ স্বভাব এবং আমার বিশেষ প্রীতি, যত্ন এবং প্রশংসার পাত্র।

তিনি এত অল্প বয়সেও বাঙ্গালার উজ্জ্বল রত্ন- আশীর্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হইয়া আপনার প্রতিভার উপযুক্ত পরিমাণে দেশের উন্নতি সাধন করুন।

[আদি ব্রাহ্ম সমাজ ও 'নব্য হিন্দু সম্প্রদায়']

২. 'পরীক্ষা-বৃক্ষ' শব্দটি মধুসূদনেরই। *তিলোত্তমাসম্ভবকাব্যের* নতুন ছন্দোরীতি প্রসঙ্গে এ-শব্দের তাৎপর্য। ঐ কাব্যের মঙ্গলাচরণ দ্রষ্টব্য।

৩. এ-প্রসঙ্গে শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য :

কিন্তু জ্বালাময়ী প্রতিভা লইয়া যাহারা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা ত বেশিদিন এ জগতে থাকিতে পারেন না। ঈশ্বরগুপ্ত ৪৬ বৎসর, কেশবচন্দ্র ৪৬ বৎসর, হরিশচন্দ্র ৩৯ বৎসর, কৃষ্ণদাস পাল ৪৬ বৎসর, মধুসূদন দত্ত ৫০ বৎসর, দীনবন্ধু মিত্র ৪৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। যে বয়স ইউরোপীয় কবিগণের মধ্যাহ্নকাল, সে বয়স বঙ্গ কবিগণের সন্ধ্যা [শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৯৮৮ : ১২২]

৪.

প্রথম খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদ	—	*মেঘনাদবধ কাব্য*	পঞ্চম সর্গ
দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদ	—	ঐ	দ্বিতীয় সর্গ
ঐ চতুর্থ পরিচ্ছেদ	—	ঐ	চতুর্থ সর্গ
তৃতীয় খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদ	—	*বীরাঙ্গনাকাব্য*	নবম সর্গ [শন্তনুর প্রতি জাহ্নবী]
ঐ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	—	ঐ	পঞ্চম সর্গ [লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পণখা]
চতুর্থ খণ্ডের	*প্রথম পরিচ্ছেদ*	—	ব্রজাঙ্গনাকাব্য
	১৩ [সারিকা]		

৫. নবীন সেনের *অবকাশরঞ্জিনী* কাব্যের আলোচনা 'গীতিকাব্য' নামে *বিবিধ প্রবন্ধ* খণ্ডে সংকলিত হয়েছে।

৬. দীনেশচরণ বসুর *মানস বিকাশ* কাব্যের সমালোচনা 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' নামে *বিবিধ প্রবন্ধ* ১ম খণ্ডে সংকলিত।

৭. *আর্যদর্শন* পত্রিকার সমালোচনা প্রসঙ্গে উক্তিটি করা হয়েছে। সমালোচক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম না থাকলেও বোঝা যায় এটি তাঁর রচনা। 'অনুকরণ' প্রবন্ধে এরকম কথাই আছে। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যেরও এই অভিমত। [অমিত্রসূদন ভট্টাচর্য ১৯৯১ : ৩০৭]।

৮. হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বাল্মীকির জয়' নামের প্রবন্ধটি *বঙ্গদর্শনের* ১২৮৭-এর পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

৯. *বঙ্গদর্শনের* ১২৮১-এর পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত রচনাটির নাম ছিল 'সেকাল আর একাল'। *বিবিধ প্রবন্ধে* সংকলিত হওয়ার কালে নাম হয় 'অনুকরণ'।

১০. দ্র. *তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য* : ভূমিকা [ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস ১৩৬১ ; ১২]।

১১. Blank verse is recognised as proper to Epic poetry in English but it is certainly very unsuited to Bengali Epics. M S Dutta alone has been able to make something of it but even his success has been achieved at a lamentable sacrifice of Grammar, idiom and perspecuity.

If you continue the poem, my advice is that you should change that a every chapter, and let it generally be Thyme.

[ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ১৩৬৬ : ১৬৪]

১২. তাঁর *সাহিত্যচর্চা*, গ্রন্থ দ্রষ্টব্য পৃ. ২৮-৪৬

১৩. *ক্যালকাটা রিভিউতে* নিবন্ধ লেখকের নাম ছাপার রেওয়াজ ঐ সময়ে ছিল না। পরে প্রকাশিত প্রস্পেকটাস থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম জানা যায়। এ তথ্যটি দিয়েছেন *বঙ্কিম রচনাবলীর* শতবার্ষিক সংস্করণের সম্পাদকদ্বয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস। এই ইংরেজি রচনাটির মধুসূদন অংশ থেকে শেষ পর্যন্ত বঙ্গানুবাদ করেন শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। *নারায়ণ* পত্রিকায় তা ছাপা হয়, পরে শচীশচন্দ্রের *বঙ্কিমজীবনীতে* অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৪. গোলাম মুরশিদ মনে করেন *ক্যালকাটা রিভিউতে* বঙ্কিম মধুসূদনের যে মূল্যায়ন করেছেন 'তাকে অবশ্যই অবমূল্যায়ন বলতে হবে [গোলাম মুরশিদ ১৯৯৫ : ২৫২]।

১৫. *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

১৬. Look at others. Your uncle Gobindachandra and Shashi chandra and Madhusudan Datta were the best educated men of the Hindu College

in this day. Gobindachandra and Shashi chandra's English poems will never live. Madhusudan's Bengali poetry will live as the Bengali language will live. [Romesh C. Dutta 1895 : 226]

গ্রন্থপঞ্জি

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য
১৯৯১　　*বঙ্কিমজীবনী* । কলকাতা ।

গোলাম মুরশিদ
১৯৯৫　　*আশার ছলনে ভুলি* । কলকাতা ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (সম্)
১২৯২　　*ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা সংগ্রহ* । কলকাতা ।

বুদ্ধদেব বসু
১৩৬১　　*সাহিত্যচর্চা* । কলকাতা ।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্)
১৩৬৬　　*নবীনচন্দ্র রচনাবলী*, ২য় খণ্ড । কলকাতা ।

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৯৮৮　　*বঙ্কিমচন্দ্র জীবনী* । কলকাতা ।

সুকুমার সেন
১৩৬৯　　*বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড । কলকাতা ।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (সম্)
১৯৮২　　*বঙ্কিম প্রসঙ্গ* । কলকাতা ।

Romesh C. Dutta
1895　　*The Literature of Bengal*. London.